০৫-০৮-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার দক্ষিণ-হস্ত (সুযোগ্য সহকারী) হতে গেলে, প্রত্যেকটা ব্যাপারেই ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ হও। সর্বদা শ্রেষ্ঠ কর্ম করো।"

প্রশ্ন :- আমাদের কোন এমন সংস্কার যার কারণে সেবার কাজে খুব বিঘ্ন সৃষ্টি করে ?

উত্তর :- জীবন যাত্রার ভাব, স্বভাবের কারণে নিজের ভিতরে দ্বৈত মতের যে সংস্কার তৈরী হয়, সেই কারণে সেবার কাজে যথেষ্ট বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। এই দ্বি-মতের জন্য অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। তখন ক্রোধের ভূত এমনই পর্যায়ে পৌঁছায় যে, ভগবানকেও রেয়াত করতে চায় না। এই জন্যই বাবা বলেন, মিষ্টি বাচ্চারা, যদি এমন কোনো সংস্কার তোমাদের থাকে, তাহলে তাকে অবশ্যই বর্জন করো।

গীত :- তকদীর জাগাকর আয়ী হুঁ .....। (তোমাদের ভাগ্যকে জাগ্রত করতেই এসেছি.....।)

ওম শান্তি। মিষ্টি-মিষ্টি রুহানি (ঈশ্বরীয়) বাচ্চারা, তোমরা গীত তো শুনলে। রুহানি বাচ্চারা- শিববাবা, যিনি সর্বোত্তম (রুহ) পরম-আত্মা, ওনার সন্তানেরা অর্থাৎ আত্মারা শরীর রূপী কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা এই গীত শুনলো। অতএব এখন তো সেই বাচ্চাদেরকে আত্ম-অভিমানী হতে হবে। যদিও এর জন্য প্রচুর পরিশ্রমও করতে হবে। বারে বারে প্রতিটি মুহূর্তেই, নিজেকে আত্মা ভেবে, এক ও একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। যেহেতু এটা হচ্ছে গুপ্ত প্রচেষ্টা। বাবা নিজেও যেমন গুপ্ত, তাই সে পরিশ্রমও তিনি গুপ্ত ভাবেই করান। বাবা স্বয়ং এসে বলছেন, বাচ্চারা- তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো, তাহলে কল্পের পাঁচ হাজার বছর পূর্বের মতো আবার সতোপ্রধান হয়ে যাবে। আর বাচ্চারাও তা জানো যে, আমরাই একদা সতোপ্রধান ছিলাম, আবার সেই আমরাই এখন তমোপ্রধান হয়েছি। তাই আবার অবশ্যই সতোপ্রধান হতেই হবে। গীতের মাধ্যমেও তাই জানাচ্ছেন -আমাদের যে ভাগ্য হারিয়ে গেছে- তা আবার ফিরে পাবার প্রয়াস ও ব্যবস্থা করছেন এক ও একমাত্র সর্বশক্তিমান এই বাবা। তিনিই সবাইকে পবিত্র-পাবন বানান। বাবা বলেন, "হে রুহানি বাচ্চারা, এখানে তো তোমরা ভাগ্য গড়তেই এসেছো। ছাত্ররা বিদ্যালয়ে ভাগ্য তৈরি করতেই তো যায়। কিন্তু তারা তো তখন ছোটো বাচ্চা। কিন্তু তোমরা তো আর ছোটো নও, তোমরা তো পরিণত, বয়স্ক। নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়ে তুলছো। এর মধ্যে কেউ কেউ আবার অতি বৃদ্ধজনও আছেন। বৃদ্ধাবস্থা থেকে কম বয়সেই পড়াশোনা ভালো হয় । কম বয়সে বুদ্ধিও তরতাজা ও তীক্ষ্ণ থাকে । এই কথাটা বোঝা সবার জন্যই খুব সহজ। তোমার শরীরটা বড়, আর ওরা তো শিশু, তাই সবটুকু সেভাবে বুঝতে পারবে না, কেননা এদের অঙ্গ-প্রতঙ্গ, ইন্দ্রিয়গুলি যথেষ্ট ছোটো। স্তুতি-নিন্দা, সুখ-দুঃখ এই সব কথা কেবল তোমরাই বুঝতে পারবে। আত্মা তো বিন্দু-স্বরূপ। শরীর বেড়ে যায়, কিন্তু আত্মা সেই এক রকমই থেকে যাবে। তা কখনো ছোট বা বড় হয় না। সেই আত্মার সুবুদ্ধির জন্য বাবা কস্তুরীর মতো সুন্দর উপহার দিচ্ছেন, কারণ এখন যে বুদ্ধি সম্পূর্ণ ভাবেই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এই ব্যাপারটা এখন খুব পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, আত্মশুদ্ধি হচ্ছে আমাদের। তাই এইসব চিত্র, দৃশ্য বা চিত্রনাট্য অন্যদেরকে বোঝাতে খুব সাহায্য করবে। ভক্তি মার্গে দেবতাদের সামনে মাথা নত করে পূজো করতে হয়। ইতিপূর্বে তোমরাও অন্ধ-বিশ্বাসী হয়ে তাই করতে। শিবের মন্দিরে যখন যেতে,

তখন কি তোমরা জানতে যে, কে এই শিববাবা। যেই বাবার থেকে পূর্বে নিশ্চয়ই আশীর্ব্বাদী বর্সা (অধিকার) পেয়ে এসেছো, তবেই না ওনার এত মহিমা কীর্তন করতে পারছো। কেউ যদি কোনও মহৎ কাজ করে থাকে, তাহলেই তো তার মহিমা গুণকীর্তন করা হয়। অতএব শিববাবারও মোহর (স্ট্যাম্প) বানানো উচিত। "শিববাবাই হলেন গীতার সারাংশ..."। তাই এই মোহর (স্ট্যাম্প) সহজেই ওনার উদ্দেশ্যে তৈরি হতেই পারে। যেহেতু এই বাবা প্রত্যেককেই সুখ প্রদান করেন। বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে সুখধামের মালিকে (অধিকারী) পরিনত করি। বৃদ্ধজনেরা এটা তো বুঝতেই পারে যে, আমরা শিববাবার কাছেই এসেছি, যিনি বিচিত্র (আকার বিহীন)। যিনি এই চিত্রে (ব্রহ্মার তনুতে) প্রবেশ করেছেন। নিরাকার কেই বিচিত্র (বিদেহী) বলা হয়। তাই বুদ্ধিতে এটা থাকা উচিত যে আমরা সেই শিববাবার কাছেই যাই। যিনি সাময়িক ভাবে এই চিত্র (আকার বা তনু) ধারণ করে আছেন। যিনি পতিতদের পবিত্র বানিয়ে মুক্তি আর জীবনমুক্তি দিয়ে থাকেন। অথবা শান্তিধাম, মুক্তি ধামের বাসিন্দা বানিয়ে দেন। মনুষ্যরা শান্তির জন্য কতই প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু ভগবানকে পেলেই তো প্রকৃত শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু সুখ পাবার জন্য তারা এত পুরুষার্থ করে না। তাদের আকাঙ্খা, একমাত্র বাবার কাছে আপন ঘরে গেলেই ভগবানকে পাবো। এই সময় প্রত্যেকেই মুক্তির ইচ্ছা মনে পোষণ করে থাকে। কিন্তু একমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণেরাই জীবন মুক্তি পেতে পারো। বাকি অন্যেরা সবাই তো জীবন মুক্তির আশায় থাকে। যেহেতু জীবন মুক্তির পথ প্রদর্শক অন্য আর কেউই নেই। লোকেরা সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে যায় শান্তির খোঁজে। সেখানে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, মনের শান্তি কেমন করে পাবো- কিন্তু যারা সেই পথ প্রদর্শক, তিনিও তো সেই মুক্তির খোঁজেই বেরিয়েছেন। মোক্ষ ব্যাপারটা কি - বুদ্ধিতে সেই ধারণাটাই তো নেই। অস্বস্তিতে, শেষে না পেরে তারা বলেন যে, মুক্তির পথে যাওয়াই ভালো। বাস্তবে মুক্তিধাম তো হলো আত্মাদের থাকার স্থান। এই যে এতো সেন্টার, কত বাচ্চারা আছে, তারা সবাই জানে যে, আমরা নতুন দুনিয়ায় (সত্যযুগের স্বর্গরাজ্যে) রাজ্য-ভাগ্যের অধিকারী হবো। এই বাবাই আমাদেরকে সেই নতুন দুনিয়ার রাজ্য-ভাগ্য প্রদান করেন। কিন্তু কোথায় সেই রাজ্য দেবেন ? তা কি নতুন দুনিয়ায় না এই পুরোনো দুনিয়ায় দেবেন ? বাবা বলেন, আমি তো কেবল সঙ্গমেই আসি। আমি না সত্যযুগে আসি আর না তো কলিযুগে আসি। এই দুই যুগের মধ্যকালে আসি। যেহেতু এই বাবাকেই তো সবার সদগতি করতে হবে। তাই না ? এমনটা তো হতে পারে না যে, আমাদেরকে দুর্গতির মধ্যেই ছেড়ে চলে যাবেন। সদগতি আর দুর্গতি দুটো তো আর একসাথে থাকতে পারে না। বাচ্চারা তো জানেই, এই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ অবসম্ভাবী। এই জন্যই তো পুরোনো দুনিয়ার প্রতি মোহ থাকা ঠিক নয়। বুদ্ধিতে তো এটাই আসে যে, বর্তমানে আমরা সঙ্গম যুগেই আছি। আর এই দুনিয়ার পরিবর্তন তো হতেই হবে। আর এখন তো বাবা স্বয়ং এসেছেন, বাবা নিজেই তা বলেন - - - আমি কল্পে কল্পে প্রতি সঙ্গম কালেই আসি। তোমাদের দুঃখ দূর করে হরির-দ্বারে নিয়ে যাই । এসব অবশ্য জ্ঞানের কথা। হরিদ্বার মানে কৃষ্ণের দ্বার অর্থাৎ কৃষ্ণপুরী বলা হয় যাকে। তারপরে আছে লছমন ঝুলা। কিন্তু আগে তো হরিদ্বারই আসবে। সত্যযুগকেই হরির-দ্বার বলা হয়। তার পর রাম, লক্ষণ ইত্যাদি সবাইকেই দেখানো হয়। আসলে এই সব ঘটনা তো ছিলই না। এ সব মনগড়া ঘটনা। রামেরা কত ভাই বলা হয়েছে ! (সত্যযুগে) ৪ ভাই তো হয় না । ৪--৮ ভাই তো এখন (কলিযুগে) হয়। যার এক দিকে থাকে ঈশ্বরীয় সন্তানেরা আর অপর দিকে থাকে আসুরী সন্তানেরা। এখন তোমরা জেনেছো যে শিববাবা এই ব্রহ্মার শরীরে অবস্থান করছেন। শিববাবা হলেন বাবা আর ব্রহ্মা হলেন দাদা। যিনি আবার প্রজাপিতাও (প্রজাদের পালক) বটে। আর উনি (শিব) আত্মাদের পিতা, যা অনাদি কাল থেকেই চলে আসছে। উনিই এই সময় কালে ব্রাহ্মণদের রচনা করান। কিন্তু

তার মানে এমন নয় যে শিববাবা শালিগ্রাম এর রচনা করেছেন। না, শালিগ্রাম (আত্মা) তো আগে থেকেই অবিনাশী। বাবা এসে তাদেরকে পবিত্র করেন মাত্র। যতক্ষণ না পর্যন্ত্য আত্মা পবিত্র হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত্য শরীর কেমন করে পবিত্র হবে ? আমাদের আত্মারা যখন পবিত্র ছিলো তখন আমরাও সতোপ্রধান ছিলাম। আর এখন আমরা অপবিত্র, তমোপ্রধান হয়েছি, আবার তাহলে সতোপ্রধান কেমন করে হবো। এটা তো অতি সহজেই বোধগম্য। তোমাদের আত্মায় ময়লা-খাদ (দূষণ) ভরে যাওয়ায় পতিত ও তমোপ্রধান হয়ে গেছো। এখন আবার তোমাদেরকে সতোপ্রধান হতে হবে। জাগতিক হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে দিয়ে সবাইকেই শান্তিধাম বা সুখধামে যেতে হবে। আত্মারা নিরাকারের ঘর থেকে কেমন করে আসে, তারই স্মরণে, খৃষ্টানরা গাছে আলো দিয়ে সাজিয়ে তাকে মনে করে। তোমরা জানো যে এখানে অনেক ধর্ম আছে, তাদের আলাদা আলাদা শাখাও আছে। আবার ওখান থেকে আত্মারা ক্রমিক অনুসারে ক্রমান্বয়ে কেমন করে নীচে আসে- তার জ্ঞানও তোমরা প্রাপ্ত করেছো। আমাদের আত্মাদের ঘর শান্তিধামে। এখন তো সঙ্গম। ওখান থেকে সব আত্মা এসে গেলেই, তারপর আবার সবাই মিলে সেখানেই যাবো। প্রলয় কিন্তু হবার নয়। তোমরা জানো যে, আবার আমরা বাবার কাছে ভাগ্য তৈরি করার জন্য ও স্বরাজ্য নিতেই এসেছি। এটা শুধু কথার কথা নয়। স্মরণের যোগ দ্বারাই আশীর্ব্বাদী বর্সা (অধিকার) পাওয়া যায়। বাবা বলেন - দেহ সহিত দেহের সম্পর্কিত সব সম্পর্ক, বন্ধু, আত্মীয় ইত্যাদি সমস্ত কিছুকেই ভুলে যাও। এগুলি সব আকার (চিত্র), আর (আত্মা) আকার বিহীন (বিচিত্র)। আকার বিহীন তাকেই বলা হয় যাকে দেখা যায় না। এই সব খুবই সূক্ষ্মকথা। আত্মা কত ছোট আকারের। তাকেই তো বারে বারে কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় করতে হয়। যা অন্যদের কারো বুদ্ধিতে এই কথাগুলি আসে না। প্রথমে তো বুদ্ধিতে এটাই ধরে রাখতে হবে যে, আমরা আত্মা, আর উনি (শিব) আমাদের বাবা। ওনাকেই আমরা পতিত-পাবন, হে, ভগবান বলে স্মরণ করি। তাই অন্য কোনো জায়গায় যাওয়ার দরকার নেই। আর স্মরণ তো ঐ একজনকেই করতে হবে। ভগবানকে স্মরণ করলে নিশ্চয়ই ওনার থেকে কিছু প্রাপ্তি তো হবেই। তাহলে এদিকে ওদিকে ঘুরে ঘুরে ধাক্কা খেতে যাবে কেন ! ভগবানকে তো পরমধাম থেকে এখানে আসতেই হবে। আমরা তো আর সেখানে যেতে পারব না। কারণ আমরা যে পতিত হয়ে আছি। পতিতেরা ওখানে যেতে পারে না। এসব জেনে এখন তোমরা খুব আশ্চর্যই হচ্ছো। ভক্তি-মার্গের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়ও কেমন আশ্চর্য জনক। সবাইকেই সেই এক ভগবানকেই স্মরণ করতে হয়। কেউ বলে- হে ঈশ্বর, কেউ হে পরমপিতা, আবার কেউ oh god father.(ও ঈশ্বরীয় পিতা)। যখন জানোই যে উনি একক ও একমাত্র, তাহলে আবার অন্য দিকে ধাক্কা খেতে যাও কেন ! সেই তিনিই যিনি অসীমে থাকেন। আর এই সবই অবিনাশী নাটকের চিত্রপটের মধ্যে গাঁথিত আছে, এবং সেই অনুযায়ী ভক্তি করা হয়- যা একদম অবুঝ ভাবে। কিন্তু, এখন আবার তোমরা অনেক বিচক্ষণ হয়েছো। শ্রীমত অনুসারে যারা চলে, একমাত্র তারাই বিচক্ষণ হতে পারে। তখন তাদের জ্ঞানের প্রতিভাকে কেউ ঢেকে রাখতে পারে না। যেহেতু তার সব কিছুই সর্বদা শ্রেষ্ঠ কর্মই প্রমাণ করে। বাবা বলেন - আমি তো দুঃখ-হর্তা, সুখ-কর্তা। সেখানে আমার বাচ্চাদেরও তো কত মিষ্ট-স্বভাবের (ভালো) হতে হবে। তোমাদেরকেই তো বাবার দক্ষিণ-হস্ত (সাহায্যকারী) হতে হবে। এই রকম বাচ্চাই বাবার খুব প্রিয় হয়। তাই তো তোমরা বাবার সাহায্যকারী হতে পারো। তোমরা তো জানোই, বাম হাত দিয়ে অনেক কিছু কাজ করা যায় না । কেননা ডান হাতই সঠিক ভাবে (ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ) কাজ করে। এই জন্যই তো ডান হাত দিয়ে শুভ কাজ করা হয়। পূজোও সব সময় ডান হাত দিয়েই করা হয়। তাই বাবা বলেন, প্রত্যেকটা ব্যাপারেই সুদক্ষ হও। এমন বাবাকে যখন পেয়েছো সেখানে তো কত খুশী হওয়া উচিত। বাবা আরও

বলেন, মামেকম্ (আমাকেই) স্মরণ কোরো, তাহলেই অন্তিমে সুখদায়ী গতি হবে । মত আর গত, অথবা গতি করার মতি- একই তো হলো। গীতেও তা গাওয়া হয় ... ঈশ্বরের মতিগতি একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। পতিত-পাবনও একমাত্র উনিই। উনিই একমাত্র জানেন, মনুষ্যগণকে পবিত্র-পাবন বানিয়ে দুর্গতি থেকে সদগতি কেমন করে প্রাপ্ত করাতে হয়। ভক্তি-মার্গে তো কত শত পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু তাতে তো আর সদগতি হয় না, ফল কিছুই পাওয়া যায় না। যেহেতু সেই সদগতিদাতা তো এই একমাত্র বাবাই। ভক্তি-মার্গে ভক্তি সহকারে যে যেমন ভাব নিয়ে পূজো করে, তাকে তেমন ফল- আমিই দিয়ে থাকি। এটাও অবিনাশী নাটকের চিত্রপটের মধ্যে গাঁথা আছে। যার যে ফল, সেই ফল সে নিজেই প্রাপ্ত করে, - - - নিজের পুরুষার্থ দ্বারা । এখন বাচ্চাদের নিজেদেরকেই পুরুষার্থ করে পবিত্র হতে হবে। তাই বাবা বার বার বলছেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, এই এক বাবাকেই কেবল স্মরণ করো। তিনিই সর্ব-শক্তিমান, অলমাইটি অথরিটি-সব কিছুরই অধিকারীসম্পন্ন নির্ভরযোগ্য। কত ভালো ভাবে যোগ্য তৈরি করেন আমাদের । তোমরা তো এ সব জেনেই গেছো, তাই এবার বাবার থেকে সেই আশীর্ব্বাদী বর্সা (অধিকার) নিতে পারছো। রচয়িতা আর রচনা দুটোরই জ্ঞান এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমরা তো জানতেই- এই জ্ঞান পূর্বে তো আমাদের ছিল না। যজ্ঞ, তপস্যা ইত্যাদি করা, শাস্ত্র পড়া, এই সবই হচ্ছে শাস্ত্রের জ্ঞান। যাকে ভক্তি বলা হয়। যার মধ্যে কোনও লক্ষ্য উদ্দেশ্য, দিশা ইত্যাদি কিছুই নেই। পড়াশোনাতেও তো উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ইত্যাদি থাকে। কোনও না কোনও জ্ঞানও তো থাকে তাতে। কিন্তু, আমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র হবার জ্ঞান- এই এক পতিত পাবন বাবাই দিয়ে থাকেন। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের- এই সব জ্ঞানই বাবা দিয়েছেন। এই সৃষ্টির চক্র কেমন করে আবর্তিত হয়, এতে সবাই তাদের নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্যের অভিনেতা । এই ভাবেই এই অবিনাশী অনাদি নাটক তৈরী করা আছে। এই অসীম বেহদ-এর (আলৌকিক) জ্ঞান নিশ্চয়ই থাকা দরকার । বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, আমরা ঘোর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত সময়ের দিকেই যাচ্ছি। তোমরাই এখন দেবতায় পরিনত হতে যাচ্ছো। এটাও বোঝা দরকার যে, আদি সনাতন ধর্মই হলো দেবী-দেবতা ধর্ম। যাকে পরিবর্তন করে হিন্দু ধর্ম বলে প্রচার করা হয়। আস্তে আস্তে এসব রহস্যের কথাও বুঝতে পারবে তোমরা। এর প্রচারে বাচ্চাদেরও জমায়েত হওয়া উচিত। যার জন্য অনেক বাচ্চাদের দরকার। দিল্লিতেও সভা-অধিবেশন, কনফারেন্স ইত্যাদি করা উচিত। দিল্লিকেই পরীস্থান বলা হয়। এখানেই যমুনা নদীর উপকন্ঠ ছিল, তখনও দিল্লি-ই ছিল রাজধানী। যা পরে অনেকেরই হাত বদল হয়েছে। দেবতাদের রাজধানীও এখানেই ছিল। তাই তো দিল্লিতেই খুব বড় আকারের কনফারেন্স হওয়া উচিত। কিন্তু মায়া এমনই -যা করতেই দেয় না। সর্বদাই বিঘ্নের সৃষ্টি করে। আজকাল তো লোকেদের হাবভাব-স্বভাব নানা প্রকারের হয়ে গেছে। তাই বাচ্চাদেরকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সেবার কাজে যুক্ত হতে হবে। যেহেতু অন্যেরা নিজেদের মধ্যে মিলে মিশে থাকে না- তাই তাদের রাজত্বেরও স্থায়িত্ব থাকে না। পার্টি দু-ভাগ হয়ে যায়। আর তখন প্রেসিডেন্ট কেও সরিয়ে দেয়। এই দ্বিমতই বড় ক্ষতিকারক। তারপর তো তারা ভগবানেরও মোকাবিলা করতে ছাড়ে না। ফলে তাদর ক্ষয়-ক্ষতিও হয় যথেষ্ট। ক্রোধের ভুত মাথায় ভর করলে, তখন যা সব করে, সে কথা জিজ্ঞাসা না করলেই ভাল। তাই বাবা বলেন, তুমি জানো আর তোমার কর্ম জানে। বাবা বাচ্চাদের সৃষ্টির আদি-মধ্য - অন্তের জ্ঞান জানিয়েছেন। এবার সেটা কেউ ধারণ করুক আর নাই করুক, সেটা তার পুরুষার্থ উপর নির্ভর করবে। কিন্তু এমনটা তো আর হবে না যে, বাবা সবাইকেই একই সমান আশীর্বাদ বা কৃপা করবেন। এখানে কৃপা, ইত্যাদি পাবার যোগ্য হওয়া চাই। যা চাইবার দরকার পড়ে না। বাবা বলেন যে, প্রেরণার দ্বারাই যদি যোগ আর জ্ঞান শেখানো যেত,

তাহলে আমি এই কলুষিত দুনিয়ায় আসবোই বা কেন ? প্রেরণা, আশীর্বাদ এই সব তো ভক্তি মার্গের কথা। কিন্তু, এখানে তো পুরুষার্থ করতে হবে, প্রেরণার কোনো ব্যাপারই নেই। তোমরা তো তিনটি ইঞ্জিন পেয়েছ একসাথে। জাগতিক রীতিতে বাবা আলাদা, শিক্ষক আলাদা, পরে গুরুকে পাওয়া যায়। এখানে তো এই তিনটির সমন্বয় একসাথে রয়েছে। বাবা বলেন, আমিই তোমাদের পূজ্য বানাই, তারপর তোমরা নিজেরাই পূজারী হয়ে যাও। খুব যুক্তি সহকারে এর ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে তোমাদেরকেই। এমন যেন না হয় যে, এ কথা শুনে কেউ যেন আবার অজ্ঞান না হয়ে যায়। সর্ব প্রথমে প্রধান হবে দুজন বাবার বিষয়টা। ভগবানই আমাদের বাবা। ওনার জন্মদিন শিব জয়ন্তী তিথি এই ভারতেই পালন করা হয়। তাই উনি ভারতকে স্বর্গ বানিয়ে দেবেন নিশ্চয়ই। যেহেতু একদা এই ভারতই স্বর্গরাজ্য ছিলো। যা এখন নরকের রাজ্যে পরিনত হয়েছে, আর তাই মহা বিনাশের নিমিত্তে মহাভারতের যুদ্ধও দোরগোড়ায় উপস্থিত। বাবা নিশ্চয়ই সেই নূতন দুনিয়া স্থাপনের উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করছেন। বাবার শ্রীমতের অনুসরণ করেই আমরা ভারতকে আবার পবিত্র পাবন ভারতভূমি হিসাবে গড়ে তুলবো। আচ্ছা!!
মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার স্মরণ-সুমন ভালোবাসা ও আশীর্বাদ। আর রইলো সুপ্রভাত। রুহানি বাবা রুহানি বাচ্চাদেরকে জানায় নমস্কার ।

. ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবা যেমন দুঃখ-হর্তা, সুখ-কর্তা, বাচ্চাদেরকেও তেমনি বাবার মতনই হতে হবে। খুব মিষ্ট-স্বভাবের হতে হবে। সর্বদা শ্রেষ্ঠ কর্ম করে বাবার দক্ষিণ-হস্তের মতো সাহায্যকারী হতে হবে।

২) কখনো দ্বিমতের মধ্যে আসবে না। জীবন যাত্রার ভাবে-স্বভাবে এর প্রভাব পড়ে। নিজেদের মধ্যে একে অপরের মোকাবিলা করবে না। ক্রোধের ভুতকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও।

বরদান :- নিমিত্ত হয়ে থাকা আত্মাদের দ্বারা কর্মযোগী হওয়ার বরদান প্রাপ্ত করার যোগ্য মাস্টার বরদাতা ভবঃ (হও)।

যখন কোনো প্রকার জিনিস সাকার রুপে দেখা হয়, তখন সেটা খুব শীঘ্রই গ্রহণ করতে পারা যায়। এই জন্যই নিমিত্ত হয়ে থাকা যে সব আত্মারা আছেন তাদের সেবার কাজ, ত্যাগ, স্নেহ, সবার সাথে সহযোগিতাপূর্ণ বাস্তবিক কর্মধারা দেখে যে প্রেরণা পাওয়া যায় সেটাই বরদান হয়ে যায়। আবার নিমিত্ত হয়ে থাকা আত্মাদের কাজ কর্মের এই সব গুণ দেখে যে ধারণা তৈরি হয়, তাতে সহজে কর্ম যোগী হবার বরদান প্রাপ্ত হয়। যিনি এমন সব বরদান প্রাপ্ত করে থাকেন তিনি স্বয়ং মাষ্টার বরদাতা হয়ে যান।

স্লোগান :- নাম কে কেন্দ্র করে সেবা কর্ম করা, অর্থাৎ উচ্চ পদকে পিছনে ঠেলে দেওয়া- সেই নামের আশায়।